প রি ক্র মা

সত্ত্বগুণময়ী

শ্রীশ্রীমা ছিলেন গাঁয়ের বধূ। বাঁকুড়া জেলার এই গণ্ডগ্রামটি যেন মানচিত্রের আড়ালে রাঙামাটির রাস্তায় স্নিগ্ধ ঝোপঝাড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল। কলকাতা সে-গ্রামের নাম শোনেনি। সেখানে ছ-বছরের ছোট্ট বধূ বাপের ঘরে আনন্দে দিন কাটাত। ছোট দুটি হাতে ঘরের কাজ, মাঠে মুনিষদের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া, গরুর জন্য জলে নেমে দলঘাস কাটা, আরও কত কাজ নীরবে করে যেত। দুর্ভিক্ষের সময়ে গরম খিচুড়ি ক্ষুধার্তের পাতে পড়লে পাখা নিয়ে দুহাতে হাওয়া করত ঠান্ডা হবে বলে। তার সেবাভাব, হৃদয়বত্তা দেখে সকলেই অবাক হত। সম্পন্ন গৃহ নয়, মাটির কুটির। সেখানে মাটির প্রদীপের মতোই জ্বলা, সাঁঝ-সকাল কাজেই বাঁধা; পড়াশোনা, পাঠশালা সবই দুর্লভ। মা জয়রামবাটীতে জন্ম নিলেন, অতি দরিদ্র রামভক্ত এক পরিবারে। বেশি জানাজানি নয়—মা-বাবাকে ইঙ্গিতে জানালেন—আমি তোমার ঘরে এলাম। এমন দারিদ্র্যের মধ্যে অন্য কোনও অবতারশক্তি এসেছেন বলে শুনিনি। একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত এক পরিবার। শ্রীশ্রীমার জীবনে ছিল না রজোগুণের জৌলুস। একান্ত আটপৌরে সাত্ত্বিক প্রতিমা। সত্ত্বগুণের এমন প্রকাশ কোনও যুগেই দেখি না। কোনওভাবেই ওই সত্ত্বগুণের আবরণ সরানো অসাধ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণ সত্ত্বগুণের অবতার। তাঁর কর্মপ্রণালী অনন্যসাধারণ। গভীর প্রেমে আকর্ষণ করেছিলেন ভক্তদের। সে-প্রেমের পাথারে কূল পাননি কেউ। দেওয়া-নেওয়ার কাজটাও প্রেমের সওদা। জোর নেই, কঠোর শাসন নেই অথচ সত্যের কঠিন পথ। ভগবানলাভ করতে এসেছিল ছেলের দল, মাস্টারমশাই। ভক্তেরা প্রশ্ন আনত—সংসারে থেকে কেমন করে যুক্ত হবে ঈশ্বরের সঙ্গে। ঈশ্বরময় মানুষটির কাছে সব উত্তর জমা থাকত—যাকে যেটি প্রয়োজন সেটি দিতেন—কার্পণ্য করতেন না। জ্ঞানের শুদ্ধ আলো বিতরণে অন্তরের তমোনাশই তাঁর নিত্যদিনের চর্যা। সেখানে সত্ত্বগুণী মহাদেবী অলিখিত সহায়তা করতেন। ভাবরাজ্যের অধীশ্বরী মা ঠাকুরের ভাবগুলি আত্মসাৎ করে হয়েছিলেন রামকৃষ্ণময়ী। সংসারে থেকেও বৈরাগ্যের বসনে ভূষিত ত্যাগের প্রতিমা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম লীলায় মা ছিলেন কাশীপুরে। তাঁর সেবায় দিনরাত কাটত উদ্বেগ ও চিন্তায়। সেখানেই শ্রীমার হাতে তিনি অর্পণ করেছিলেন এক মহান দায়—সে-দায় বিশ্বজননীর, ভক্তজননীর। সাধারণ পল্লীবধূরূপে সেই দায় গ্রহণ যে কত বড় শক্তির পরিচয় তা জগৎ প্রত্যক্ষ করার আগেই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসান। আকারে ইঙ্গিতে বলা সেই মহাদায়ের মহাভার মা গ্রহণ করেছিলেন। কেউ জানল না আর জানানোর দায়ও ছিল না।

শ্রীমা সাধারণ দৃষ্টিতে বিধবার মতোই তীর্থে তীর্থে ঘুরলেন। পূর্ব পূর্ব অবতারলীলার রোমন্থন করে বর্তমানের বোধ-বুদ্ধি-শক্তি যেন পরিপূর্ণ করলেন। অলৌকিক চালচিত্র যোগ করে, এই সাত্ত্বিক প্রতিমাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যুগ থমকে দাঁড়াল। তিনি জগতে রয়েছেন অঙ্গে একখানি বস্ত্র জড়িয়ে। সাজগোজ, গরিমা, ভঙ্গিমা কিছুই নেই। তিনি যে চিরন্তনী অবতারশক্তি কে বলবে? শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয়েরা তাঁকে কখনও ভাড়াবাড়িতে ঠাঁই করে দিচ্ছেন, কখনও তিনি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাপের বাড়ি বা ভাইদের কাছে থাকছেন, কামারপুকুরে বাসও সাংসারিক মানুষের স্বার্থপরতায় দুষ্কর হয়ে যাচ্ছিল। জগতের জননীকে এমন অবস্থাবিপাকেই দিন কাটাতে হত। শারীরিক শ্রম করতে হত। দু-দণ্ড নিজের মনে কাটানোরও

অবকাশ নেই। ইষ্টদর্শন যাঁর হাতের মুঠোয় তিনি মানুষের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। চাহিদা নেই, বাসনা নেই, নেই কোনও প্রত্যাশা। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে অবগুণ্ঠনে ঢাকা শ্রীমুখ। এতবড় মহিমার ওপর শুভ্র দীন আবরণ। আমরা জানি, আমাদের মা একদিকে দুঃখিনী—আশৈশব দুঃখের আগুনে, দারিদ্র্যের আঁচে যেন সংসারে পড়ে আছেন। দুঃখ মা হওয়ার—শতসহস্র সন্তানের বেদনার ভার নেওয়ার। যেন কত নিরুপায়, প্রতিকারহীন জীবন। অন্যদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য, আত্মীয়-পরিজনের প্রতিকূলতা নিয়ে চলেছেন। এই সত্ত্বগুণময়ীর দুটি হাতে শুধু আশীর্বাদ, করুণা, ক্ষমা ও ভালবাসা। আঁখিভরা জল সন্তানের জন্য—সে-সন্তান সাধু, গৃহী, ডাকাত সকলেই। তিনি যে এবার সতেরও মা, অসতেরও মা! ভালর মা, মন্দটিরও। এই তো সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য! অলৌকিক শক্তির প্রদর্শন নেই। ফুল-বেলপাতার নির্মাল্য দিয়ে সব করে দিচ্ছেন। ঘুমের ঘোরে অজ্ঞানের ডোরে বাঁধা সন্তানকে সরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে আনন্দকাননে মুক্তির সোপানে রাখছেন। এমন সাধারণী মাকে দেখে এযুগের মানুষ অবাক। কী নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, ঘোষণাহীন জীবন! এই সাত্ত্বিক প্রতিমা কোনও যুগেই আমরা দেখিনি যিনি অবতারের শোকে মুহ্যমান হয়ে লোকের অগোচরে দিন কাটাননি। মা গৃহী, সন্ন্যাসী, সাধারণ মানুষ, পাগল, মাতাল সকলেরই মা হয়ে রয়েছেন। অন্তরঙ্গ যোগীন-মা মায়ের দিনযাপনের একটি চিত্র দিয়েছেন। সেখানে দিনের শুরু থেকে শেষ একসুরে বাঁধা। ঠাকুরের পূজা, ভোগ, ভক্তদের কৃপাবিতরণ, প্রসাদবণ্টন ও জপধ্যানের একনিষ্ঠ চিত্র। সবই নীরবে, অন্তরালে। তাঁর সরল সহজ ব্যবহার, চেহারায় গ্রাম্য বধূর ছায়া, ভাষা ভারি মিষ্টি। রুক্ষতা নেই। অভিজাত কলকাতা অবধি তাঁর সামনে নতদৃষ্টি। এ কোন নারী? মহিমার ছটা ছাড়াই মহিমময়ী, আভিজাত্য ছাড়াই সম্মানের উচ্চাসনে! বিশাল সংসারের লাগাম ধরে রয়েছেন অনায়াসে। এই ঘোষণাহীন কর্তৃত্ব তাঁর নম্র-মধুর ভাষা ও ভালবাসায় সকলকে আপন করে রাখছে। মৃদুতারই জয়।

সত্ত্বগুণময়ী মা সন্তানদের শিখিয়ে চলেছেন—ধর্ম গোপনের ধন, অন্তরের সম্পদ। সংসারের কোণেও তাকে নিয়ে আনন্দে থাকা যায়। ঈশ্বর দূরের বস্তু নন, একান্ত আপনার—তাঁর ওপর নির্ভর করে জীবন কাটানো যায়। তাঁর ভালবাসা, করুণা, কৃপার শেষ নেই। এযুগের প্রহ্লাদেরা বাপের কোল, মায়ের আদর দুই-ই পাবে।

স্বামীজী প্রথম এই অবগুণ্ঠনে আবৃতা জননীকে বুঝেছিলেন। তাই জ্যান্তদুর্গার কথা বারবার বলেন গুরুভাইদের কাছে। মার ভূমিকা যে এযুগে সকলকে ছাড়িয়ে, পুরাণকে ছাপিয়ে যাবে তা কে জানত? এবার একক শক্তির বিরাট প্রকাশ। তাঁর ভূমিকা ভূমিকে ছাড়িয়ে ভূমার দিকে প্রসারিত। সত্ত্বগুণের দেবী বহুহাতে অস্ত্র ধরেননি। তৃতীয় নয়নে জ্যোতিও নেই। মুখ নিপাট সহজ সরল গ্রাম্যবালার। সেখানে কীসের শোভা? নিরাসক্তি, নির্বাসনা আর নির্লিপ্তির। বৈরাগ্যের আগুন আর বিবেকের ঔজ্জ্বল্য সুকুমার অথচ দৃঢ় অঙ্গসংস্থানে। কেশের রাশি পর্দার মতো আড়াল করেছে তাঁর সংহারমূর্তিকে। আননে মহাশান্তভাব, ধীরস্থির বুদ্ধি। চোখ স্তব্ধ হয়ে যায়। রূপ-ছাড়া এ কী রূপ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর চাউনিতে নড়ছে। অচেতন চেতনায় জ্বলে উঠছে।

মা, তোমার সাজগোজ নেই, তার প্রয়োজনও নেই। তুমি প্রাণময়ী, চৈতন্যময়ী, সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর সত্ত্বমূর্তি। সন্তান চাইবার আগেই তার পাত্র পূর্ণ করো মা। আজকের কথা কি বারবার বলতে হবে? মা, তুমি তোমার মহাসত্ত্বগুণে এযুগকে, বিশ্বমানবকে নিঃশব্দে বিপন্মুক্ত করো। তোমার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম।